রবীন্দ্রনাথের ছবি-এ প্রজন্মে
তন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

‘‘বাংলাদেশে শিল্পকলার নতুন অভ্যুদয় হয়েছে। আমি সেই শিল্পীদের জাপানে আহ্বান করছি নকল করার জন্য নয় শিক্ষা করার জন্য’’-

‘‘আমাদের দেশের আর্টের পুনর্জীবন সঞ্চারের জন্য এখান কার সজীব আর্টের সংশ্রব যে কত দরকার সে তোমরা তোমাদের দক্ষিণের বারান্দায় বসে কখনোই বুঝতে পারবে না।’’

‘‘ভারতবর্ষের আর্ট যদি পুরোজোরে মন-প্রাণ দিয়ে এগোতে পারে তাহলে গভীরতায় ও ভাব ব্যঞ্জনায় তার কাছেকেউ লাগবে না।’’

‘‘আমাদের আর্ট রোদেন ষ্টাইনের ধামাধরা না হলে যদি প্রতিষ্ঠা না পায় তবে সে আর্ট মহাকালের ঝাঁটার তাড়নায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আস্তাকুঁড়েই ঠাঁই পাবারযোগ্য।’’

বিভিন্ন সময়ে এমন সব মতামত জানিয়ে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ--চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ।
এই উক্তি গুলি থেকেই স্পষ্ট যে ভারতবর্ষের শিল্প একটা সময় তারচলার ছন্দ হারিয়ে ফেলেছিল। যা হয়ত আমাদের অনেক মহান মহান শিল্পীই অনুভব করেছিলেন কিন্তু তা থেকে বেরিয়ে আসার সাহস বা পথ কোনটাই দেখাতে পারেন নি- যেটা পেরেছিলেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। জীবন দর্শন এবং সংস্কৃতি বোধের এমন এক জায়গায় পৌঁছেছিলেন যেখানে থেকে উপলব্ধি করেছিলেন এ থেকে মুক্তির প্রয়োজন। শেষ একটি দশক জুড়ে প্রায় আড়াই হাজার ছবি এঁকে ছিলেন, যদিও এর শুরু অনেক আগেই। পান্ডুলিপির কাটাকুটিতেই। জোরালো সব আকার, কখনো মানুষ, কখনো অজানা জন্তু ফুল লতা পাতা সবই হয়ে গেছে পেনের আঁচড়ে এবং সেখানেও তিনি স্বতন্ত্র। এবার যোগহলো রং। প্রতিকৃতি, প্রকৃতির প্রায় সব কিছু জন্তু জানোয়ার,গাছপালা, নদী, ফুল ফল পাখি সব। উজ্জ্বল রং কখনো বা কালো আঁচড়ে সেই উজ্জ্বলতাকে একটু ম্লান করেদেওয়া, কখনো বা তীক্ষ্ণ কালো অথবা সাদার (যা সাদাকাগজ ছেড়ে যাওয়া) আউটলাইন।

প্রথাগত শিক্ষা না থাকায় অনেকখানি স্বাধীনতা আরোপ করতে পেরেছেন নিজের ছবিতে। এতদিন ধরে আমাদের ছবিতে যেটার অভাব ছিল অভিব্যক্তি আর ছন্দের স্বতঃস্ফুর্ত প্রকাশ ছবির কাঠামোকে ঠিক রেখে। যাকে যামিনী রায় বলেছেন ‘সতেজ শিরদাঁড়া’। এটি রবীন্দ্রনাথ যোগ করতে পেরেছিলেন এবং আমরা এখন যাকে আধুনিক শিল্প বলি তার দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন। আদিম অভিব্যক্তি ময়তার সঙ্গে বুদ্ধিদীপ্ত উপস্থাপনায় ছবির রচনাগত (কম্পোজিশানাল) ভারসাম্য অনন্য হয়ে উঠেছে তাঁর ছবিতে। প্রায় সব ছবিতেই বস্তু বা আকার এবং তারপাশের জমি বা শূন্যতা -(অর্থাৎ পজিটিভ স্পেস আর নেগেটিভ স্পেস)এর মধ্যে যে সম্পর্ক এমন টানটান প্রয়োগ এর আগে আমাদের সমসাময়িক ছবিতে হয়নি বললেই হয়।

পাশ্চাত্যের বিশেষ শিক্ষা পদ্ধতিতে যখন সচেতন ভাবে আমাদের আর্ট স্কুল গুলোকে ভালো ক্রাফ্ট্ম্যান তৈরীর কারখানা বানানো হচ্ছে তখন একমাত্র রবীন্দ্রনাথ-ই এর বিরুদ্ধে গিয়ে শুধু 'কলাভবন' খুলেই থেমে থাকেননি নিজে হাতে তুলি ও রং তুলে নিয়েছিলেন। তিনি প্রথম দেখিয়ে ছিলেন শুধু পাশ্চাত্যের অ্যাকাডেমিক শিক্ষা প্রণালী নয় আবার ভারতীয় তার নামে এক দুর্বল শিল্পশৈলী তৈরী নয়, পূর্ব-পশ্চিমের মেলবন্ধনের মধ্যে দিয়েই আমরা পৌঁছাতে পারবে আমাদের স্বকীয়তায়। তিনি বারবার জাপানের কথা বলেছিলেন এ প্রসঙ্গে।কেননা তারা ছাড়া নিজস্ব শিল্প টিকে এ ভাবে দৈনন্দিনতার সঙ্গে তখনোকেউ গ্রহণ করতে পারেনি।

ভারত শিল্পের মূলস্রোত আর পশ্চিমের খোলা আকাশ তার দৃষ্টিতে ছাপিয়ে পড়েছিল এ সমস্ত উপলব্ধির মধ্যেদিয়েই। তাই নন্দলাল গুরুদেবের ছবি প্রসঙ্গে বলেছিলেন---''লোকপ্রিয় আর বস্তুনিষ্ঠ অঙ্কন পদ্ধতির সর্ববিধিনিষেধ কবি হেলায় লঙ্ঘন করতেন। কোনো রীতি পদ্ধতির সযত্ন অনুশীলন কখনো করেননি, অথচ চিত্র তাঁর অবাস্তব হতো একথা কিছুতেইবলা চলে না।তাদের বাস্তবতা স্বতন্ত্র এক স্তরে। সাধারণ মানুষ এই রূপকল্পনার মহত্ব সম্পর্কে স্বভাবতই সন্দিহান। তাতে এইমাত্র প্রমান হয় যেকোন্ বস্তুর ছবি সেদিকেই তার যাকিছু আগ্রহ অথবা কৌতুহল, সামগ্রিকভাবে ছবিটা কি সে তার বুদ্ধির বিশেষতঃ বোধের অগোচর।... পূর্বে এদেশেব শিল্পীরা বাস্তবরীতির অনুশীলন করেননি। বস্তুরূপের বিজ্ঞান সম্মত নিরূপণ তাঁদের জানাইল না। তবু তাঁরা ছিলেন অপূর্ব রূপের স্রষ্টা।''- গুরুদেবও ছিলেন এই ঘরানার শিল্পী। তিনি নিজেও বলেছেন ''রূপের সার্থকতা যদি রূপে ফুঠে ওঠে তবেইতো ওরা রইল।'' আসলে গুরুদেবের এই চিত্রচর্চার পশ্চাৎ ভূমিতে আছে জীবনব্যাপী শিক্ষা, সংস্কৃতি ও চির সাধনা- যথার্থই বলেছেন নন্দলাল। ক্রমশ আমাদের আধুনিক শিল্পে রবীন্দ্রনাথ অপরিহার্য হয়ে পড়েছেন।

সমসাময়িক শিল্পীদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ছবির প্রত্যক্ষ প্রভাব অনেক শিল্পীই স্বীকার করেন। আবার রবীন্দ্রনাথের এই ছবি বিষয়ক আধুনিক চিন্তা-ভাবনা ছাড়া যে এগোনো যেতনা তাও স্বীকার করেন অনেকে যাঁরা হয়তো তাঁদের কাজের দিক দিয়ে সরাসরি রবীন্দ্রনাথের অনুসারী নন।

যেমন এযুগের প্রখ্যাত চিত্রকর রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন 'রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য ছাড়া আমরা রামকিংকর, নন্দলালকে পেতাম না। হয়ত আবার এনারা ছাড়া আমরা নিজেরা এগোতাম কি ভাবে সে পথও আমাদের অজানাই থেকে যেতো। আর অনেক ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথই তো শেষ কথা।''

সরাসরি প্রভাবিত এ যুগের বিখ্যাত চিত্রকর--রবীন মন্ডল, যোগেন চৌধুরীর ছবিতো আমরা দেখেছি। রবীন মন্ডলের 'মুখবয়ব' গুলিতে যোগেশ চৌধুরীর রচনাগত বাঁধুনিতে রবীন্দ্রনাথকেই মনে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের ছবি প্রসঙ্গে যোগেন চৌধুরী বলেছিলেন'ভীষণ ভাবে রাবীন্দ্রিক' শুধু এই কথাটুকুতেই আমরা বুঝতেপারি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ জীবনের প্রান্তলগ্নে করা কাজ গুলিতেও ওইটুকু সময়ের মধ্যেই শতকরা একশ ভাগ নিজস্বতায় পৌঁছেছিলেন।

শুধু তাই নয় আজকের প্রজন্মের কাছেও রবীন্দ্রনাথের ছবি একই ভাবে গ্রহণীয় এবং আকর্ষণীয়। একেবারে তরুণ প্রজন্মের অন্যতম উল্লেখযোগ্য শিল্পী প্রমথেশ চন্দ্র (১৯৭২) বলেন 'পৃথিবীর বহু ভালো ছবি যেমন ভালো লাগে তেমনির রবীন্দ্রনাথের ছবিও ভালো লাগে'। তবে অনেকের সঙ্গে তিনি একটি ব্যাপারে একমত নন তাহলো রবীন্দ্রনাথের ছবি প্রসঙ্গে চালু 'অশিক্ষিত পটুত্ব' কথাটিতে। 'তা একবারেই নয়'। প্রমথেশ রবীন্দ্রনাথের ছবিতেও দেখতে পান রঙের ওপেক্ কোয়ালিটি, রঙের বুনট, রংও রেখার দক্ষ প্রয়োগ যথেষ্ট 'পটুত্ব'। ভীষণ 'টাচি'। একই সঙ্গে ক্ল্যাসিক্যাল ও আধুনিক। তিনি অনায়াসে স্বীকারকরেন ''দুঃখ হয় এমন ছবি আঁকতে পারলাম কই!'' এইমুহূর্তে সিরামিক আর্টে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নাম পার্থ দাশগুপ্ত(১৯৬৬)। তাঁকে কি ভাবায় রাবীন্দ্রিক ছবি? তাঁর সিরামিক পটে বাম্যুরালে কি কখনো প্রভাব ফেলে সে সব ছবি? পার্থ বললেন --'মজার ব্যাপারে হলো রবীন্দ্রনাথের স্বতন্ত্রভাবে ছবি আঁকার সূচনায় ছিল'স্ক্রিলিং'। যা বলা আর না বলা কথার আঁকাবুকি থেকে শুরু। পরবর্তী সময়ে স্বতন্ত্র ছবিগুলিতেও যে রঙীন লেখার অভ্যাসের আচরণ লক্ষি হয়। আমি তাই তাঁর লেখাকেও ছবি বলি'। পার্থর করা ড্রইং গুলিতে রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই বিদ্যমান এবং সেসব ড্রইংগুলি যেহেতু শুধু কাগজে নয়, তাঁর তৈরী ভাসগুলির গায়েও এক অদ্ভুত রাবীন্দ্রিক অলঙ্করণময়তা নিয়ে আসে তাই সে প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন ''তাঁর ছবি লেখার পটের জন্য শুধুই কাগজ কলম নয়, যেকোন মাধ্যমেই টানটোন তল-অবতলে ঘটতে পারে। তল-অবতলের কথায় আমি বলতে চাইছি যে সমতল ক্ষেত্রেই নয় যেকোন ত্রিমাত্রিক ক্ষেত্রেও এই ছবিলেখার বিন্যাস সম্ভব যেমন সিরামিক্ মাধ্যমে। যেহেতু আমি সিরামিককে মনে করি ছবি আর ভাস্কর্যের সেতু তাই তাঁর ছবির বিন্যাস এতে অন্যমাত্রা পেতে পারে। শুধু তাই নয় সেগুলির স্থায়িত্বও বৃদ্ধি পেতে পারে। রোজ নামচার সঙ্গে সিরামিকের যে যোগ, তাতে রবীন্দ্রচর্চা শুধু সকাল বিকালের বাঁধা রেওয়াজ-ই নয়, রান্নাঘরের গুন-গুন সঙ্গীতের সাহচর্য্য পাবে। রবীন্দ্রনাথের ছবির যে সার্বজনীনতা তার বিস্তার ঘটতে পারেএবং তা ঘটেছেও।

এ যুগেই অত্যাধুনিক মেট্রোরেল স্টেশনে এমনকি বিভিন্ন ম্যুরালে রবীন্দ্রনাথের ছবির সরাসরি যথেচ্ছ (....) প্রয়োগ দেখা যাচ্ছে। মাধ্যম থেকে মাধ্যমে সে রূপান্তরিত হচ্ছে, পাচ্ছে মাধ্যমগত স্থায়িত্ব আর ব্যাপক প্রসার। ক্রমশ উন্মোচিত হচ্ছে তাঁর ছবির এই নানান দিক্গুলি। যেগুলি তাঁর মতো দূরদর্শীরও অদেখা ছিল। কেননা তিনি নিজের দেশের ক্ষেত্রে তাঁর সৃষ্টির এই দিকটির(ছবি) গ্রহণীয়তা সম্পর্কে নিজেই সন্দিগ্ধ ছিলেন। কিন্তু তাঁর দেখানো পথে ভারতবর্ষের আধুনিক শিল্প অনেক দূর এগিয়ে এসেছে তাঁকে সঙ্গে নিয়েই। এগুলি তারই পরিচয়। তাই আজও বোলপুরে গীতাঞ্জলী ভবনে একালের তিন শিল্পী রামলাল ধর, দীপালি ভট্টাচার্য, সুমন পাল প্রায় হাজার স্কোয়ারফিট জুড়ে করলেন তাঁরই করা ছবি দিয়ে এক বিশাল ম্যুরাল। যেখানে বোঝার উপায়নেই কোন এক শিল্পির সত্তর বছর আগের করা ছবি সত্তর বছর পরেও কত আধুনিক তার রচনার গুণে, তার ছন্দের গুণে তার স্বকীয়তারগুণে। কি বলিষ্ঠতার গঠনগত রূপায়নে। তাই এ সময়ের প্রখ্যাত ভাস্কর গোপীনাথ রায়ের (১৯৫৩) কথা দিয়েই শেষ করা যেতে পারে এ প্রসঙ্গ। ''যদি সেই পিরিয়েড থেকে রবীন্দ্রনাথের ছবির সঠিক মূল্যায়ন হতো আজ আমরা অনেকদুর পর্যন্ত এগিয়ে যেতে পারতাম।'' - যদি হয়তো অনেক দেরী হয়েছে তবু চলটা যে শুরু হয়েছে এ আর বলার অপেক্ষাই রাখেনা।''

কলেজস্ট্রিট পত্রিকায় প্রকাশিত

তন্ময় ব্যানার্জী শান্তিনিকেতন থেকে ফাইন আর্টস নিয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষা সম্পূর্ণ করেছেন। বর্তমানে গর্ভনমেণ্ট আর্টকলেজে শিক্ষকতায় নিযুক্ত । ভাস্কর্যকে তাঁর শিল্পীসত্বার বহিঃপ্রকাশের মূল মাধ্যম হিসাবে বেছে নিলেও কাগজ-রং -এর মাধ্যমেও তাঁর অনায়াস প্রবেশাধিকার। ব্রোঞ্জ, পাথর,টেরাকোটা প্রভৃতিকে হাতিয়ার করেই চলে তাঁর শিল্পসাধনা। আর এই সাধনার ফাঁকতালেই চলে লেখালেখি নিজ বিষয়কে ভালবেসে, কেন্দ্র করে। তথ্য, বিশ্লেষণে ও বর্ণনায় পরিপূর্ণএই লেখাগুলি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে থাকে।